উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন

'ফাজায়েলে আমাল' পরিচিতি

বর্তমান দুনিয়ায় পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক পঠিত এবং সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ 'ফাজায়েলে আমাল'। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক আকারে দ্বীনি আমলের প্রেরণা সৃষ্টি, দুনিয়ামুখী মুসলমানদের দ্বীনমুখীকরণ এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা.) বিমুখ মানুষকে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর তরীকামুখী করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অত্যধিক ভূমিকা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তাবলীগি জামাআত

এটি মুসলিম উম্মাহর এমন একটি দাওয়াতী কাফেলা যারা নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ, সুশৃঙ্খল ও নিরলষভাবে কোরআন ও সুন্নাহর বাণী নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি জনপদে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এর বরকতে সিরাতে মুস্তাকীমের পথে আসছে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান।

তাবলীগ এবং সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন নেসাব

ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থটি তাবলীগ জামাআতের দৈনন্দিন নেসাব হিসেবে যেমন বিশ্বের প্রায় মসজিদে পঠিত হয়, তেমনি এর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্তরা কিতাবটির অলৌকিক আকর্ষণ এবং আল্লাহর কাছে এর মকবুলিয়্যাত আঁচ করতে পেরে নিজের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের হেদায়াতের আশায় ঘরে ঘরেও কিতাবটির পঠন-পাঠন চালু রেখেছেন।

লেখক

কিতাবটির লেখক বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব কান্ধভলী (রহ.)। তাঁর এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট যে, নিকট অতীতে যে সকল বড় বড় মুহাদ্দিস হাদীসের সঠিক খেদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্তাদ তিনি। তাঁর অভূতপূর্ব হাদীসের খেদমাত-লিখিত শরাহ তথা হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বিভিন্ন কিতাব এখনও সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন দরসেগাহে সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য কিতাবে কী আছে

শুধু আলোচ্য কিতাব তথা তাঁর লিখিত কয়েকটি কিতাবের সংযুক্তরূপ 'ফাজায়েলে আমাল' গ্রন্থটি গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করলে অনুমান করা যায় ছোট-বড় কত হাজার কিতাব হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর মুতালাআধীন ছিল। কত শত শত কিতাবের নির্যাস এই ফাজায়েলে আমাল। আরো প্রতীয়মান হবে পবিত্র কোরআনসহ কতসংখ্যক হাদীস, তাফসীর ও সিয়ার গ্রন্থের নূরের সংমিশ্রণ এতে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, যেহেতু এই কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য মকবুলে আম করে দেবেন তাই তাঁর প্রেরিত নবী রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈন মোট কথা তাঁর অগণিত মুকাররাব বান্দার কিছু না কিছু নূর এই কিতাবে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। সে কারণে দেখা যায় কিতাবটিতে একদিকে পবিত্র কোরআনের আয়াত, হাদীসে রাসূল, বড় বড় মনীষীদের হাদীসের ব্যাখ্যা, বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরগণের তাফসীর সন্নিবিষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে নবী রাসূলগণের বিভিন্ন সত্য ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরামের হেকায়াত, তাবেঈন তবেতাবেঈন, সলফে সালেহীন এবং ওলী বুযুর্গদের কাহিনী সংকলন করা হয়েছ এতে। যা শুধু ঈমানকে তাজাই করে না বরং বেঈমানকেও ঈমানদার বানাতে সাহায্য করে।

কিছু পরিতাপ কিছু শুকরিয়া

কিন্তু পরিতাপ হয় তাদের জন্য, যারা বুঝে হোক, না বুঝে হোক, পরিকল্পিতভাবে হোক বা অজ্ঞাতসারে এই কিতাব তথা 'ফাজায়েলে আমাল' সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভট, মিথ্যা, প্রতারণামূলক বানানো অভিযোগ উত্থাপন এবং তা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোকে দৈনন্দিন নেসাবী আমল বানিয়ে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম তো বরবাদ করছেই, মুসলমানদের মাঝেও সঠিক দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তবে একটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া সকলকেই করতে হয়, তাহলো, হাদীসে যেমন আছে 'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন না।' তেমনি এ কথাও বাস্তবতার আলোকে সত্য, হক্কানী জমাআতের মধ্যে ছদ্মবেশী মোনাফেকদেরকে আল্লাহ তা'আলা যেকোনো সময় জাহিরও করে দেন এবং মুসলমানদের মঝে তাদেরকে নিজেদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, লেখা-বক্তৃতা ইত্যাদির

মাধ্যমে চিহ্নিতও করে দেন। তাই তাদের কেউ নিজেরাই বলে দেন, আমি তাবলীগ জামাআতে অনেক দিন কাটিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে এই সেই... পেয়েছি। আমি দেওবন্দ মাদরাসাতেই পড়েছি। কিন্তু এখন তাওবা করেছি... ইত্যাদি। এসব হলো হক থেকে বাতিলকে পৃথক করা এবং মুসলমানদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার খোদায়ী পন্থা। সুতরাং মিডিয়াতে বসে বিভিন্নজনের উদ্ভট চেঁচামেচি, সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে বাহারি অপপ্রচারে পরিতাপের কোনো কারণ নেই। বরং এর দ্বারা মোনাফেকরা নিজেদের কুৎসিত চেহরা নিজেরাই উন্মোচন করে হক্কানী জমাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

একটি মূলনীতি

দ্বীন পালনের সহজার্থে একটি মূলনীতি সকল মুসলমানের মনে রাখা উচিত, তা হলো ইসলামের মূলধারা থেকে ছিটকে পড়া যাবে না। বরং তা হবে সম্পূর্ণরূপে গোমরাহী। দ্বীনের নামে রকমারি মোড়কে অনেক কিছু আসবে, অনেক জৌলুস-কৃত্রিম আড়ম্বরতা পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু সাহাবা, তাবেঈন, সলফে সালেহীনের পন্থাতে মূল ধারাবাহিকতায় অটল অবিচল থাকতে হবে। এর বাইরে যত কিছুই আমরা দেখব, মনে করতে হবে আরেকটি গোমরাহীর পদধ্বনি অথবা আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে হক থেকে পৃথক করে মুসলমানদের মাঝে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন।

একটি বিধর্মী নীলনকশা

সন্দেহপ্রবণতা একটি মহাফেতনা। আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির উপকার যদিও পুরো বিশ্ববাসী পেয়েছে;কিন্তু এর পরিকল্পিত বালা-মুসিবত সবই চাপানো হয়েছে মুসলমানদের ঘাড়ে। একেক সময় একেক কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের বিপথগামী করার প্রচেষ্টাও বিরামহীনভাবে চলছে। এমন এমন ডাহা মিথ্যা অভিযোগও মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে, যাতে মুসলমানগণ পরস্পর সহাবস্থান থেকেও নিরাশ হয়ে পড়ে। তাই তো আজ সারা মুসলিম বিশ্বে কেউ হয়তো জঙ্গি, কেউ হয়তো দুর্নীতি পরায়ণ, কেউ ডিক্টেটর, কেউ মৌলবাদী, কেউ কেউ আতংকবাদী ইত্যাদি। এগুলো যে কারো নীলনকশারই বরকত এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে সব বিষয়ের একটি যোগসূত্র হলো সন্দেহ পরায়ণতা। এই নীলনকশা বাস্তবায়নে তাদের পুরোপুরি কামিয়াব বলা না গেলেও সফলতা অনেক।

সরাসরি ধর্মীয় আকীদা ও ইবাদাত বিষয়ে মুসলমানদের সন্দেহপ্রবণ করে তোলা, ধর্মীয় কর্ণধারদের–এমনকি পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভক্তি-শ্রদ্ধা মুসলমানদের অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির ওপর বিভক্তি ঘটিয়ে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শক্তিকে ধ্বংস করা তাদেরই পরিকল্পিত অপপ্রয়াস। সঠিক জ্ঞান ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে পবিত্র কোরআন-হাদীস ও ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাস পাঠে তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

এর ওপর ভর করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম নবাগত বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে থাকেন। যেহেতু মানুষের স্নায়ু বিকৃতির জন্য প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ওই মহল থেকে বেশির ভাগ মিডিয়াকেই ব্যবহার করা হয়। তাই উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন মিডিয়াতে আসা ধর্মীয় কথাগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারেও সতর্কতা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে তো আছেই।

অভিযোগের বন্যা

সম্প্রতি ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে কিছু চিহ্নিত লোকের অভিযোগের শেষ নেই। মনে হবে সমাধান শুধুই শুধু তাদের মত ও পথ। বাকি সম্পূর্ণ ইসলাম অভিযুক্ত। তাদের এই অভিযোগের নিশান হয় সরাসরি খাইরুল কুরুনের (ইসলামের স্বর্ণালী অনুসরণীয় যুগ) মহাব্যক্তিগণ। সাহাবায়ে কেরামও তা থেকে বাদ নেই। (নাউজু বিল্লাহি মিন যালিক)। রাসূল (সা.)-এর ভাষ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের মডেল হলো খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের অনুসরণীয় যুগ। এই চিহ্নিত মহলের ভাষ্য মতে ইসলামের মডেল হলো তারাই। অনেক ক্ষেত্রে খাইরুল কুরুনের মহাব্যক্তিবর্গ তো তাদের মাপকাঠিতে মুসলমান হিসেবে পরিগণিত কি না, তাতেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। (নাউজু বিল্লাহ)

শুধু এ বিষয়টি বিবেচনায় নিলেও নিঃসন্দেহে একজন মুসলমান বলতে পারবেন, এ ধরনের যাবতীয় আয়োজন বিধর্মীদের উল্লিখিত নীলনকশারই একমাত্র বাস্তবায়ন। বিষয়টিকে এতদভিন্ন মূল্যায়ন করার কোনো পন্থা এবং কোনো সুযোগ থাকে না।

ফাজায়েলে আমালের ব্যাপারে অভিযোগ

পবিত্র কুরআনের পর বর্তমানে সর্বাধিক পঠিত ও সর্বাধিক ভাষায় মুদ্রিত কিতাব 'ফাজায়েলে আমাল'-এর ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ, যা বিভিন্ন বই-পুস্তক, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি তাও একই মহল থেকে একই পরিকল্পনার অধীনেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যখন আমরা দেখব, অভিযোগগুলোর ধরণ কী? তাদের অভিযোগ কী এবং অভিযোগের বিপরীত তাদের হুকুম কী? অভিযোগের সাথে তাদের দাবি কী?

সর্বপ্রথম শিরকের অভিযোগ

ফাজায়েলে আমাল খুললেই দেখা যাবে হযরত যাকরিয়া (রহ.) লিখিত কিতাবের ভূমিকা। এই ভূমিকার একটি লাইন নিয়ে

ওই মহলের একটি অভিযোগের প্রতি লক্ষ করুন।

শিরোনাম দেওয়া হয়েছে–'তাবলীগি নেসাবের ভূমিকাতেই শিরিক'। 'তাবলীগি নিসাবের লেখক শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.) বলেন, "উলামায়ে কেরাম ও সূফীকুলের শিরোমণি, মোজাদ্দেদে দ্বীন, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আমাকে আদেশ করেন যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন অনুসারে কোরআন ও হাদীস অবলম্বনে যেন একটা সংক্ষিপ্ত বই লিখি। এত বড় বুযুর্গের সন্তুষ্টি বিধানে আমার পরকালে নাজাতের উসিলা হইবে মনে করিয়া আমি উক্ত কাজে সচেষ্ট হই।"

এখানে ওদের অভিযোগ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি না চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টির আশায় কিতাবটি তিনি লেখেছেন। সুতরাং তা শিরিক হয়েছে। শুধু এই দাবিটি করেই শিরক এবং কুফরের ওপর বিভিন্ন কোরআন-হাদীস এনে মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অথচ তারা খেয়াল করে না যে, তাদের দাবিটা কোথায় গিয়ে ঠেকে।

নিরসন : আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মানুষের সন্তুষ্টি কি এক জিনিস?

হযরত যাকারিয়া (রহ.) প্রথমে হামদ সালাত পড়েন। তাতে আল্লাহর গুণগান ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যত এখান থেকেই আরম্ভ করেন। স্বয়ং ওসব মহলের মতে নিয়্যত মুখে বলা বিদআত! কিন্তু এ ক্ষেত্রে এসে তারা নিয়্যত মুখে না বলার কারণে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করল!!

এরপর তিনি কিতাবটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কিভাবে এবং কী কারণে কিতাবটি লেখার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। এ ক্ষেত্রে বলেছেন, তাঁকে এই বিষয়ে কিতাব লেখার নির্দেশদাতা তাঁরই আপন চাচা হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর নির্দেশ পালনার্থে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কিতাব লেখতে তিনি উদ্যোগী হলেন। তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর জন্য দু'আ করবেন এবং তাঁর দু'আ হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর নাযাত লাভের উসিলা হবে। এই হলো মূল ব্যাপার।

'মানুষকে সন্তুষ্ট করা শিরিক' কথাটি অযৌক্তিক। কারণ, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে মাতা-পিতাকে খুশি ও সন্তুষ্ট করার নির্দেশ এসেছে। মুসলমানদের খুশি এবং সন্তুষ্ট রাখার কথা তো কোরআন-হাদীসে বিভিন্ন ভাবেই এসেছে। স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছেন যে,

وعنْ عبد اللَّهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) :(رِضَا اللَّه فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّه فِى سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ .(أَخْرَجَهُ التِّرمذىُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আর আল্লাহর নারাযী পিতার নারাযীর মধ্যে। (তিরমিযী ২/১২ হা. ১৮৯৯)

এখন বিবেচনা করুন উক্ত অভিযোগকারী মিথ্যুক প্রতারকদের কথা 'মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো কিছু করা শিরিক" এ অভিযোগ কোথায় গিয়ে ঠেকে? তাহলে কি তারা রাসূল (সা.) সম্পর্কেও এ অভিযোগ করল!!!

ফাজায়েলে আমালের বিন্যাস

ফাজায়েলে আমাল মূলত একটি কিতাব নয়। বরং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে লেখা কয়েকটি কিতাবের সংযুক্তরূপ। কিতাবগুলো হলো ১. হেকায়াতে সাহাবা। ২. ফাজায়েলে তাবলীগ। ৩. ফাজায়েলে কোরআন। ৪. ফাজায়েলে নামায। ৫. ফাজায়েলে রামাজান। ৬. ফাজায়েলে দরূদ। ৭. ফাজায়েলে যিকির। ৮. ফাজায়েলে হজ। ৯। ফাজায়েলে সাদাকাত।

যেহেতু তাবলীগ জামাআত কিতাবগুলোকে তাদের তালীমের নেসাবে অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাই কিতাবগুলোকে বিভিন্ন প্রকাশক দাওয়াতের কাজে গমণকারীদের সহজার্থে একত্রিত ভলিয়ম আকারে বাইন্ডিং করেছেন। সে সময় এটির নাম হয়ে যায় তাবলীগি নেসাব। আরো বেশ কিছুদিন পর তাবলীগি মুরব্বিদের পরামর্শে এটিকে ফাজায়েলে আমাল নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) ফাজায়েলে আমালের কিতাবগুলো কখন কেন এবং কিভাবে লেখেছেন, তারও বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে। এই ছোট পরিসরে সেদিকে আমরা যাব না।

মূল আলোচনা বোঝার সহজার্থে কিতাবগুলোতে কোন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা জানার প্রয়োজন আছে। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) কিতাবগুলোতে একটি নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করেছেন। যে বিষয়ের কিতাব প্রথমে উক্ত বিষয়ে কোরআন মজীদের কিছু আয়াত উল্লেখ করে এর অর্থ এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে বড় বড় মোফাসসিরগণ থেকে নেওয়া তাফসীর উল্লেখ করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীস থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে উক্ত আয়াতের নির্যাস এবং আবেদনকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে কিছু জরুরি কথা বলেছেন। এতদসংক্রান্ত সলফে সালেহীনের কোনো ঘটনা থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন।

এরপর উক্ত বিষয়ে কিছু হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন। হাদীস শরীফের বেলায় তাঁর নীতি হলো প্রত্যেকটা হাদীস তিনি কোন কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা উল্লেখ করা। উক্ত হাদীসের ওপর মুহাদ্দিসগণের কোনো মন্তব্য থাকলে তাও সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ওপর যে

আলোচনা তিনি উল্লেখ করেছেন তা শুধুমাত্র আলেম-উলামাদের জন্য বিধায় হাদীসের অনুবাদ করতে গিয়ে উক্ত আরবী আলোচনাগুলোর অনুবাদ করেননি। আবার হাদীসের আলোচনায় যেদিক থেকে হাদীসটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, উক্ত দিকগুলোই বেশির ভাগ আলোচনা করেছেন।

এর কারণ হলো, হাদীসের ওপর কালাম শুধুমাত্রই মুহাদ্দিসগণের মতামত। এসব কোনো কোরআন-হাদীসের ফায়সালা নয়। সুতরাং যে মত তিনি পছন্দ করেছেন, সে মতকেই প্রাধান্য দিয়ে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হিসেবে আমানতদারীর সাথে এই কাজ করা তাঁর দায়িত্বও বটে।

এরপর তিনি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বড় বড় মুহাদ্দিসগণের মতামত, আরো কিছু আনুষঙ্গিক আয়াত ও হাদীস, মুসলমানদের কাছে উক্ত হাদীসের আবেদন, হাদীসের আবেদনের ভিত্তিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়, এতদসংশ্লিষ্ট উৎসাহ প্রদানকারী সলফে সালেহীনদের কিছু ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। যাতে সব মিলিয়ে উক্ত আয়াত ও হাদীসের ওপর আমল করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

ফাজায়েলে আমালের ওপর আরোপিত অপবাদগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ

ফাজায়েলে আমালের ওপর আরোপিত অপবাদের মৌলিক ধরন তিনটি।

১. ফাজায়েলে আমালে জয়ীফ ও মওজু হাদীস রয়েছে।

২. ফাজায়েলে আমালে মিথ্যা ও শিরকী কাহিনীর ছড়াছড়ি।

৩। কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং ভ্রান্ত তর্জমা।

এসব অপবাদ দিয়ে ফাজায়েলে আমালের ওপর হুকুম আরোপ করা হয় কিতাবটি বিদআতী এবং শিরকী কিতাব।

এই হুকুমের ওপর ভিত্তি করে দাবি জানানো হয় কিতাবটি বর্জনীয়। অর্থাৎ কিতাবটি পড়া যাবে না।

এই দাবি পালনে উৎসাহিত হওয়ার জন্য এর সাথে এ কথাও জুড়ে দেওয়া হয়, মুসলমানদের কাজ হলো শুধু কোরআন ও হাদীস পড়া। সেখানে ফাজায়েলে আমাল কেন পড়া হবে?

এই হলো ফাজায়েলে আমাল নিয়ে মিডিয়া জগতে একটি মহল থেকে একতরফা তোলপাড়ের মূল পরিধি।

নাস্তিকদের একটি নীতি আছে তা হলো, "মিথ্যা কথা বার বার বলো। একসময় তা সত্যের মতই বিবেচিত হবে।"

তোলপাড়ের ধরন দেখে মনে হবে উক্ত মহল এই নীতিমালাটিই সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে। কারো কথা শোনার দরকার নেই, শুধু মিথ্যা বলতেই থাকো।

প্রতারণার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত

ফাজায়েলে আমালের বেলায় তারা বলে থাকে, ইসলামের হুকুম হলো কোরআন-হাদীস পড়া। মুসলমানগণ ফাজায়েলে আমাল কেন পড়ে?

প্রিয় পাঠক, একটু চিন্তা করুন। তাদের কথাটা কত সুন্দর, কত চিত্তাকর্ষক। মুসলমান মাত্রই এই কথা গ্রহণ করতে দেরি হবে না। কিন্তু আপনি তাদের কাছে এই প্রশ্নটা করেছেন? আচ্ছা হুজুর! আপনি যে ফাজায়েলে আমালের ব্যাপারে বই লিখলেন, বা মিডিয়ায় কমেন্ট করলেন তা কি পড়ার জন্য লেখেছেন, নাকি এমনিতেই? যদি আপনি বইটি পড়ার জন্যই লেখে থাকেন, তাহলে কেউ না কেউ এ কিতাব বা কমেন্ট পড়বে। আপনার দাবি মতে যাদের শুধু কোরআন-হাদীস পড়াই আবশ্যক, অন্য কিছু পড়া হারাম তাদেরকে আপনি হারামে লিপ্ত করার জন্যই কি এই কিতাব লিখলেন। আপনাদের যারা বিভিন্ন কিতাবাদী লেখেন তারাও কি মুসলমানদের হারাম কাজে লিপ্ত করার জন্য লেখছেন?... নাকি আপনি মুজাস্সাম কোরআন-হাদীস?!! (নাউজু বিল্লাহ)

তাহলে দোষ কি শুধু ফাজায়েলে আমালের?

তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তাদের প্রতারণামূলক কথার হাকীকত কী?

আমাদের এই আয়োজনে যা থাকছে

উল্লিখিত তিন ধরনের অপবাদের মধ্যে আমাদের এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো, হাদীসবিষয়ক আলোচনা। আমরা দেখব ফাজায়েলে আমালে কি সবই জয়ীফ হাদীস, না অন্যান্য হাদীসের কিতাবের মতো কিছু কিছু তাতেও জয়ীফ হাদীস রয়েছে? যদি অন্যান্য হাদীসের কিতাবের মতো এতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি কিছু জয়ীফ হাদীসেরও উপস্থিতি থাকে, তাহলে শুধু ফাজায়েলে আমাল বর্জনীয় কেন? জয়ীফ হাদীস যদি সত্যিকার অর্থেই বর্জনীয় হয় এবং জয়ীফ হাদীসের কারণে যদি কিতাবই পড়া বাদ দিতে হয় তবে তো দুনিয়ায় একটি কিতাবও এমন পাওয়া যাবে না, যাতে কারো না কারো মতের ভিত্তিতে কোনো জয়ীফ হাদীস নেই।

এখানে দুটি কথা, যারা জয়ীফ এবং মওজু হাদীস বলে ফাজায়েলে আমালের ওপর অপবাদ দিয়ে তা বর্জন করার জন্য দাবি জানাচ্ছেন তারা কি মুসলমানদেরকে এই উসূলের ভিত্তিতে সকল হাদীসের কিতাবই বাদ করে দেওয়ার আগাম মেসেজ দিচ্ছেন, নাকি ফাজায়েলে আমালের কারণে মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছেন বিধায় নিজেদের আক্রোশ এবং জিঘাংসাকে মানুষের সামনে অন্য ভাষায় প্রকাশ করছেন?

এ বিষয়টি বোঝার জন্য প্রয়োজন হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং ফাজায়েলে আমালের হাদীসগুলোর

রেফারেন্স ও তাহকীক।

হাদীসের উসূল সম্পর্কে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে বড়-ছোট অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তাই হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এখানে করা হবে না। পাঠকগণ প্রয়োজনে কিতাবাদী পাঠ করে তা জেনে নিতে পারবেন।

ইনশাআল্লাহ ছুম্মা ইনশাআল্লাহ এই আয়োজনে ধারাবাহিকভাবে ফাজায়েলে আমালের আরবীতে লেখা মূল হাদীসগুলো এবং আনুষঙ্গিকভাবে উর্দুতে ছোট ছোট যেসব হাদীসের অনুবাদ আনা হয়েছে, সেগুলোর তাখরীজ এবং তাহকীক প্রকাশ করা হবে।

এর পূর্বে যে বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন, তা হলো জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য কি না এবং মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে জয়ীফ হাদীস এনেছেন কি না?

জয়ীফ হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য : হাদীস সহীহ, জয়ীফ ও মওজু হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণই মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতামত। তাও এটি আবার দুই প্রকার। হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা-অনির্ভরযোগ্যতা তথা সনদের ওপর যে আলোচনা তা বর্ণনাকারী তথা রাবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা পুরোপুরি মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতামত। হাদীসের মতন নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য তার ভিত্তিও ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের মতামত। এক্ষেত্রে ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মূলনীতিও একেক রকম। সহীহ ও জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা জায়েয-নাজায়েযের হুকুমও উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং কেউ যদি মনে করে হাদীস সহীহ জয়ীফ হওয়ার বিষয়টিও কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হবে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মনগড়া ব্যাখ্যা। সুতরাং যারা বলবে ইসলামে ইজমা, কিয়াস (অনুমান) এবং উলামায়ে কেরামের মতামতের কোনো ভিত্তি নেই, তাদের জন্য হাদীসের সহীহ জয়ীফ হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ এবং তার ওপর আলোচনা করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই, যৌক্তিক অধিকারও নেই। কেউ যদি সে রকম করে, তা হবে স্পষ্ট নির্লজ্জতা এবং প্রতারণার শামিল।

হাদীস অস্বীকারের ভয়ঙ্কর প্রচারণা

সম্প্রতি হাদীস সম্পর্কে একটি মহল মুসলমানদের মাঝে জয়ীফ জয়ীফ বলে হাদীসের প্রতি যেভাবে ঘৃণা সঞ্চারের চেষ্টা করছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। মূলত জয়ীফ আখ্যায়িত করে হাদীসকে ঘৃণা করা মানে হাদীস অস্বীকার করা। জয়ীফ হাদীস আর মওজু হাদীসের একই হুকুম যারা বর্ণনা করে তারা মুনকিরীনে হাদীসেরই একটি দল। কারণ সহীহ জয়ীফ সনদ হিসেবে হাদীসের প্রকার। সনদের ক্ষেত্রে জয়ীফ হলেও তা হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে দুনিয়ার সকল মুহাদ্দিস যেকোনো ভাবে হলেও জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জয়ীফ হাদীস অস্বীকারকারীও মুনকিরে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারী। তবে মওজু বা বানানো হাদীস পরিত্যাজ্য। জয়ীফ হাদীস পরিত্যাজ্য নয়। সামনের আলোচনায় তা ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হবে।

জয়ীফ হাদীসের বিধান

সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতামত হলো, হাদীসের সনদ যদি অত্যন্ত জয়ীফ হয় তার ওপর আমল করা জায়েয নেই। এই ইজমা আল্লামা সুয়ূতী ও হাফেজ সালাহুদ্দীন (রহ.) উল্লেখ করেছেন। (তাদরীবুর রাবী ১/২৯৮) (বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জয়ীফ বলতে মূলত মওজু হাদীসকেই বোঝানো হয়েছে)

যদি হাদীসের সনদ অত্যন্ত জয়ীফ না হয় তবে মুহাদ্দিসগণের ইজমা হলো এরূপ হাদীস ফাজায়েলে আমাল, আখলাক, কাহিনী এবং তারগীব তারহীবের বেলায় গ্রহণযোগ্য। এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন, আল্লামা নববী (রহ.) ও মোল্লা আলী কারী (রহ.)। (তাঁদের বর্ণিত এই ইজমাসহ জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত জানার জন্য দেখুন আলফাতহুল মুবীন লিল হায়সামী পৃ ৩২, ফতহু বাবুল ইনায়া ১/৪৯, আল হাজ্জুল আওফার ফীল হজ্জিল আকবর বা/১৪৯, মিরকাত ২/৩৮১, আল আসরারুল মরফূআ ৩১৫, মুকাদ্দামুত তারীফ ১/৯৮, আল কিফায়া ১৩৩, আলমাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলীল ২৯, মুকাদ্দামুল জারহে ওয়াত্তাদীল ২/৩০, শরহুল আলফিয়া ২/২৯১, শরহে ইললিত তিরমিযী ১/৭২-৭৪, মজমুউল ফতাওয়া ১৮/৬৫,৬৭, ফতহুল আলাম ৩৮২, আলমজমু লিননববী ৩/৩৪৮, আত্তাক্বরীব বিশরহিততাদরীব ১৯৬, আল আযকার ৭,৮, ইনসানুল উয়ূন ফীসীরাতিল আমীন মামুন ১/২, উয়ূনুল আসর ১/১৫, আলমাদখালুস সগীর ৩৭, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী ১/২২, ফতহুল মুগীছ ১২০, উলূমুল হাদীস ৯৩, আল ফাতহুল মুবীন ৩৩, তানকীহুল আনযার ২/১০৯-১১১, আলমাকামাতুস সুনদিসিয়্যা পৃ. ৫, আল মুগনী ১/১০৪৪, আল ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যা লিইবনি তাইমিয়া ১১০০, আত্তারজীহ লি আহাদীসি সালাতিত তাসবীহ পৃ৩৬, শরহু কাওকাবুল মুনীর ২/৫৬৯, নাইলুল আওতার ৩/৬৮)

'ফাজায়েলের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য নয়'– কথাটি ঠিক নয়?

শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহ.) তাঁর কাওয়ায়েদুত তাহদীস কিতাবে (পৃ. ১১৩ তে) লেখেন, কেউ কেউ বলেছেন ইমাম

বোখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (রহ.) এবং আবু বকর ইবনুল আরবী (রহ.)-এর মতে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না। সেরূপ আল্লামা ইবনে সায়্যিদিন নাস ইয়াহয়া ইবনে মুঈন সম্পর্কে, আল্লামা সাখাবী (রহ.) ইবনুল আরবী মালেকী (রহ.) সম্পর্কে, ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে এবং আল্লামা শাহরাস্তানী আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) সম্পর্কে এরূপ বলেছেন। (উয়ূনুল আসর ১/২৪, ফতহুল মুগীস ১/২৬৮, শরহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৪)

অথচ এ সকল মুহাদ্দিস ইমামগণ থেকে সরাসরি এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না যে, ফাজায়েলে আমালের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর মোটেও আমল করা যাবে না। বরং স্বয়ং ইমাম বোখারী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যায় ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল তাঁর মতেও জায়েয। যেমন হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) ফতহুল বারীর মুকাদ্দামায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দু রহমান তাফাবীর ব্যাপারে كن فى الدنيا كانك غريب এর অধীনে লেখেন, "এই হাদীস তো তাফাবী একাই বর্ণনা করেন। এটি 'সহীহুন গরীবুন'-এর আওতায় পড়ে। মনে হয়, ইমাম বোখারী (রহ.) তারগীব ও তারহীবের ক্ষেত্রে নিজের শর্তসমূহ পুরোপুরি আমলে নেন না। (হাদয়ুসসারী, পৃ. ৪৬৩)

মোট কথা হলো, সহীহে বোখারীর বিভিন্ন বর্ণনাকারীর ওপর বিভিন্নজনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) তাঁর কিতাব 'হাদয়ুসসারী মুকাদ্দামাতি ফতহিল বারী' তে একটি 'বাব' কায়েম করেন। তাতে বোখারী শরীফের বিভিন্ন রাবীর ব্যাপারে বিভিন্ন জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, এই হাদীসটি তারগীব তারহীব ও রেকাকের বিষয়। আল্লামা জফর আহমদ উসমানী তাঁর কিতাব 'কাওয়ায়েদুল হাদীসে تساهل البخارى فى احاديث الترغيب والترهيب শিরোনামের অধীনে হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.)-এর জবাবের পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, এতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় মুহাদ্দিসীনগণ ফাজায়েলের হাদীসের ক্ষেত্রে নম্রতা পোষণ করে থাকেন, যদিও কিছু লোক এসব বিষয়ে খামোখা জড়িত হন এবং কঠিন শর্ত আরোপ করে থাকেন।

বোখারী শরীফ ব্যতীত ইমাম বোখারী (রহ.)-এর অন্যান্য কিতাবে তিনি জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বোখারী (রহ.)-এর কিতাব, 'খলকু আফআলিল ইবাদ', 'জুযউ রফইল ইয়াদাইন', 'জুযউল কিরাআতি', 'আল আদবুল মুফরাদ' ইত্যাদির বিভিন্ন নুসখায় বহু জয়ীফ হাদীস রয়েছে বলে মুহাদ্দিসগণ মত পোষণ করেছেন।

তারীখে কবীরে রাবীদের উল্লেখ হিসেব ড. মুহাম্মদ আব্দুল করীম বলেন, মরফূ হাদীসের সংখ্যা মোট ১১২৭। তাতে ২১০টি সহীহ, ৩৭০ হাসান, জয়ীফ হাদীস ৩৯৯ এবং মওজু হাদীস একটি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহে মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবেও জয়ীফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন প্রমাণ মুহাদ্দিসগণের লেখাতে পাওয়া যায়। (দেখুন ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কিতাব 'আততামীয' তাহকীক ড. মুস্তফা আজমী)

এ ছাড়া মুহাদ্দিসীনদের আরো বিভিন্ন দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইমাম বোখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বেলায় হাদীসের সিহহাতের ওপর যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, তা তাদের অন্যান্য কিতাবে পুরোপুরি অবলম্বন করেননি। এই বাস্তবতা প্রমাণ বহন করে ইমাম বোখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.)-এর মতেও জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য।

জয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য হওয়া না হাওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসে কবীর ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.)-এর দুটি মত পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে সায়্যিদিননাস বর্ণনা করেন, নাজায়েয। (উয়নুল আছর ১/৬৫) খতীবে বাগদাদী ও আল্লামা সাখাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, জায়েয। (কেফায়া ২১৩, ফতহুল মুগীছ ১/৩২২) হযরত ইবনে আদী ইবনে মরয়াম থেকে বর্ণনা করেণ যে, তিনি বলেন, আমি ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি যে, রেকাক বিষয়ে ইদ্রিস ইবনে সেনান থেকে হাদীস নেওয়া যাবে। (আল কামেল ১/৩৬৬) এই কথা থেকে জয়ীফ হাদীস ফাজায়েল ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়াই হযরত ইবনে মুঈনের শক্তিশালী মত বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হলো, কোনো বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া না গেলে যদি উক্ত বিষয়ে জয়ীফ হাদীস থাকে তবে কিয়াস করার চেয়ে জয়ীফ হাদীস উত্তম। ইমাম ইবনে হাজমও এর ওপর একমত পোষণ করেছেন। (দেখুন আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম ৭/৫৪, আল মহল্লী ৪/১৪৮)

কাজী শাওকানী (রহ.)-এর কিতাবাদী যেমন নাইলূল আওতার, তুহফাতুয যিকির এবং ফতহুল কদীর ইত্যাদি কিতাবাদীতে, যেখানে তিনি সিহহাতের শর্ত লাগিয়েছেন তাতেও মুহাদ্দিসগণের মতে জয়ীফ হাদীসের অভাব নেই। (আল ফাওয়ায়েদুল মজমুআ, পৃ. ২৮৩)

মুহাদ্দিস মাহমূদ সঈদ 'আততারীফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ফাজায়েলের ব্যাপারে জয়ীফ হাদীস অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আরবীর কোনো স্পষ্ট কথা উল্লেখ নেই। (আততারীফ, পৃ. ১০১)

বিশেষ সম্প্রদায়ের ইমাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান কনুজী নিজ কিতাব 'নযলুল আবরার'-এর শুরুতে দাবি করেছেন যে, তিনি জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করবেন না। এমনকি বিভিন্ন স্থানে তিনি আল্লামা নববী (রহ.)-এর বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তিনি তার কিতাব জয়ীফ হাদীস দ্বারা ভরে দিয়েছেন।

এমনিভাবে দীর্ঘ মোতালাআর পর এ কথা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, জয়ীফ হাদীস ঢালাওভাবে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য বলাটা পুরোপুরি ভুল ও ভ্রান্ত। বরং সবার কাছে কিছু না কিছু পর্যায়ে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমলের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

হাদীস বর্ণনা করার সময় সহিহ ও জয়ীফ উল্লেখ করা জরুরী বিষয় নয়

মুহাদ্দিসগণের নিকট জয়ীফ হাদীসের ওপর এর জূউফ উল্লেখ করা শর্ত নয়। আল্লামা ইবনুস সালাহ তাঁর 'মুকাদ্দামা'তে লেখেন, জয়ীফ হওয়ার হুকুম উল্লেখ করা ছাড়াই এধরনের হাদীস বর্ণনা করা যায়। তবে আল্লামা ইবনুসসালাহ জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করার কিছু পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন। (মুকাদ্দামায়ে উবনুসসলাহ ১১২)

আল্লামা ইরাকী (রহ.) বলেন, জয়ীফের হুকুম উল্লেখ করা ছাড়াই বর্ণনা করা জায়েয। (আলফিয়্যাতুল হাদীস ১/৩৩০)

বিভিন্ন কিতাবে জয়ীফ হাদীস

আকায়েদের কিতাব :

উপরের আলোচনায় বোঝা গেল মুহাদ্দিসীনের কাছে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয়। কিন্তু আকায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। আকায়েদ সাব্যস্ত হতে হয় কতয়ী দলিল দ্বারা। সে কারণে আকায়েদের কিতাবাদীতে জয়ীফ হাদীস না থাকা বাঞ্ছনীয়। তার পরও এখানে কয়েকটি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলো আকায়েদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হওয়া সত্ত্বেও জয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

১. হাফেজ আবু বকর উমর ইবনে আবু আসেম জহহাক ইবনে মুখাল্লাদ আশশায়বানী (রহ.)-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ' কিতাবে মুহাদ্দিসগণের মতে ২৯৮টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

২. ইমাম আবু আব্দুর রহমান ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আশশায়বানী (২৯০ হি.)-এর কিতাব 'কিতাবুস সুন্নাহ'-এ জয়ীফ হাদীসের সংখ্যা ৩০৩ বলে মুহাদ্দিসীনগণের মতামত রয়েছে।

৩. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন খাল্লাল (৩১১ হি.)-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে ৩৮৯টি জয়ীফ হাদীস আছে বলে মুহাদ্দিসগণের মত।

৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আজরী বাগদাদীর 'কিতাবুশ শরীআ'তে মুহাদ্দিসীনের মতে ৬৫৭টি জয়ীফ ও কিছু মওজু হাদীস রয়েছে।

৫. ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর 'কিতাবুল আসমা ও ওয়াসসিফাত' গ্রন্থে মুহাদ্দিসগণের মতে ৩২৯টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে। (দেখুন তাহকীকুল মাকাল)

আহকামের কিতাবে জয়ীফ হাদীস

আকায়েদের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ব্যাপারে যে কঠোরতা, সে তুলনায় আহকামের ব্যাপারে কিছুটা গৌণ। তাতেও দীর্ঘ মোতালাআর পর দেখা যায় বিভিন্ন ইমাম নিজ নিজ শর্ত ও নীতিমালা সাপেক্ষে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয় বলে মত দিয়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তা পালনও করা হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে, যদি অতিরিক্ত সাবধানতা ও সতর্কতা তাতেই নিহিত থাকে। (আততাদরীব ১/২৯৯)

আল্লামা যারকাশী (রহ.) লেখেন, (আল্লামা ইবনে সালাহ) আহকামের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে কিছু সূরত উক্ত মতের বহির্ভূত রাখা সমীচীন। প্রথম বিষয় হলো, যদি উক্ত হাদীস ছাড়া উক্ত বিষয়ে আর কোনো হাদীস না থাকে। আল্লামা মাওয়ারদী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে কোনো বিষয়ে যদি মুরসাল হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস না থাকত তখন তিনি উক্ত মুরসাল হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। আল্লামা মাওয়ারদীর রায় হলো অন্যান্য জয়ীফ হাদীসেও একই হুকুম। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর আমলও এরূপ, যদি জয়ীফ হাদীসের বিপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস না পেতেন তবে উক্ত জয়ীফ হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। (আন নিকাত আলা ইবনিস সালাহ ২২/৩১৩) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কোনো বিষয়ে কোনো জয়ীফ হাদীস থাকলে তখন কিয়াসের ওপর উক্ত হাদীসকেই প্রাধান্য দিতেন। (আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম ৭/৫৪)

ইমাম শওকানীর উস্তাদ শায়খ আব্দুল কাদের ইবনে আহমদ আর কুকাবানী লেখেন, যখন মুতাআখখেরীন মুহাদ্দিসগণ (পরের যুগের মুহাদ্দিসগণ) বলেন, এটি গাইরে সহীহ বা সহীহ নয় তখন এর উদ্দেশ্য এমন নয় যে, উক্ত হাদীস অগ্রহণযোগ্য, বা আমলযোগ্য নয়। এর উদ্দেশ্য এও নয় যে, এর ওপর আমল জারি নেই। আমরা এরূপ অর্থবোধক একটি শব্দও তাদের কাছে পাই না। সুতরাং পরের যুগের কোনো মুহাদ্দিস যদি বলেন যে, এটি গাইরে সহীহ বা সহীহ নয়। তখন তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এটির তাহকীক করা হবে। যদি উক্ত হাদীস হাসন বা জয়ীফ এবং তার ওপর আমল থাকে তবে এর ওপর আমল করা যাবে। অন্যথায় ত্যাগ করা হবে।

(আত্তুহফাতুল মরজিয়্যা ফী হল্লি বা বাজিল মাশকিলাতিল হাদীসিয়্যাহ, পৃ. ১৮৬)

এ বিষয়টিও অতিদীর্ঘ। সব কিছুর মুতালাআর পর এ কথাই সিদ্ধান্ত হবে যে, কখনও কখনও আহকামের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

ফিকহী কিতাবসমূহে জয়ীফ হাদীস

আল মুন্তাকা। এটি হলো শায়খে হাম্বলী, আবুল বারাকাত ইমাম হাফেজ মজদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবীল কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল খাজর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ আল হাররানী আল মারূফ বি ইবনি তাইমিয়ার কিতাব।

কিতাবের প্রারম্ভে লেখেন, এটি রাসূল (সা.)-এর হাদীসের একটি মজমুআ। যার ওপর উসূলে ফিকহের ভিত্তি। উলামায়ে ইসলাম এই কিতাবের ওপর আস্থাশীল। আমি সহীহ বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা থেকে হাদীসগুলো চয়ন করেছি।

এই কিতাব সম্পর্কে আল্লামা শওকানী লেখেন, হাদীস শাস্ত্রের একটি অভিজ্ঞ দল বলেছেন, যদি 'মুনতাকা'র মধ্যে হাদীসের হুকুম লাগিয়ে দিতেন তবে এটি হাদীস শাস্ত্রের বড় উন্নত কিতাব হতো...।

অথচ এই কিতাবে মুহাদ্দিসগণের তাহকীক অনুযায়ী ২৬২টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজর (রহ.)-এর কিতাব বুলুগুল মরাম ফী আদিল্লাতিল আহকাম। মুহাদ্দিসীনদের হিসাব মতে, এই কিতাবে ১১৭টি জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

ইমাম নববী (রহ.)-এর কিতাব খুলাসাতুল আহকাম মিন মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া কাওয়ায়িদিল ইসলাম। ইমাম নববী (রহ.) আহকামের হাদীস জমা করে তা থেকে বেছে বেছে শুধু সহীহ ও হাসান হাদীস একত্রিত করে সংকলন করেছেন খুলাসাতুল আহকাম। মুহাদ্দিসীনের গণনায় এই কিতাবে জয়ীফ হাদীসের সংখ্যা ৬৫৪।

ইবনুল মুলাক্কিন শাফেয়ীর কিতাব তুহফাতুল মুহতাজ। এই কিতাব সম্পর্কে লেখক নিজেই লেখেন, এই কিতাবে উল্লিখিত সকল মাসায়েল সম্পর্কে সহীহ ও হাসান হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কথা হলো, জয়ীফ হাদীসের এবং আসারের। তা যথাসম্ভব কম পেশ করেছি। তবে এই কিতাবের আমারই লিখিত শরাহ উমদাতুল মুহতাজ ইলা কুতুবিল মিনহাজে আমি জয়ীফ হাদীস দ্বারা বিভিন্ন স্থানে দলীল গ্রহণ করেছি। (মুকাদ্দামায়ে তুহফাতুল মুহতাজ ১/১২৯,১৩০)

এখানে কয়েকটি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলো। যেগুলোতে আহকামের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, মুহাদ্দিসীনের কাছে জয়ীফ হাদীস আহকামের ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় এবং প্রায় আহকামের কিতাবে জয়ীফ হাদীস রয়েছে।

আলবানী সাহেবের কীর্তি

শায়খ আলবানী সাহেব তো গোটা হাদীসের জগতকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। এক ভাগের নাম তাঁর ভাষায় সহীহ, অপর ভাগের নাম জয়ীফ। এবার বলুন কোনো কিতাবে যঈফ হাদীস থাকলেই যদি তা বর্জনীয়, ছুড়ে ফেলার উপযুক্ত, পাঠের অযোগ্য দলিল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তাহলে তো ওই চিহ্নিত মহলটির কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীসের কিতাবেরই অস্তিত্ব থাকে না। তবে তারা বোখারী-বোখারী, মুসলিম-মুসলিম বলে যিকির করলে কি লাভ হবে?

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আলোচনা করা হলো। এসব আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। ফন্নী বা শাস্ত্রিকভাবে আলোচনা করতে গেলে কয়েক শ পৃষ্ঠাতেও আলোচনা শেষ হবে না। কিন্তু নবাবিষ্কৃত কিছু লোকের বিভিন্ন প্রতারণা ও ধোঁকাকে স্পষ্ট করার জন্য সামান্য আলোচনা করা হলো।

এই আলোচনা থেকে যা বোঝা গেল

১. বর্তমান সময়ে কিছু মহল জয়ীফ হাদীস বলে হাদীসের প্রতি মুসলমানের অন্তরে যেভাবে ঘৃণা সঞ্চারের চেষ্টা করছে মূলত জয়ীফ হাদীসের বিষয়টি সেরূপ নয়। জয়ীফ আর মওজু হাদীসকে একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হাদীস জগতে বড় ধরনের খিয়ানত। মুনকিরীনে হাদীস ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না।

২. সকল মুহাদ্দিস যারা শর্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর থেকে কঠোর তাঁদের কাছেও বিভিন্নভাবে জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৩. জয়ীফ হাদীস শুধু ফাজায়েলে নয়, আহকামেও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি আকায়েদের ক্ষেত্রে অনেকে জয়ীফ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন।

৪. যারা জয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন, মূলত তারা এর দ্বারা মওজু হাদীস বা তার স্তরে পৌঁছে গেছে এমন হাদীসের কথাই বলেছেন।

৫. জয়ীফ হাদীস তো নয়ই বরং মওজু হাদীসও কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হলে তা বর্জনীয় বলে উম্মতের কেউ বলেননি।

৬. 'জয়ীফ ও মওজু হাদীস সম্বলিত কিতাব বর্জনীয়' এই নীতি গ্রহণ করা হলে দুনিয়ায় সমস্ত হাদীস, ফেকাহ এবং তাফসীরের কিতাব সম্পর্কে মুসলমানগণ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্যও এটি।

সুন্নাহের ওপর আমলের মূলনীতি

উপরেও বলা হয়েছে, হাদীসসংক্রান্ত সহীহ জয়ীফের যে দীর্ঘ আলোচনা দুনিয়াতে আছে সবই মুহাদ্দিসীনের মতামত। এর কোনো দলিল কোরআন-হাদীসে নেই। কিন্তু যেহেতু বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম সকলে ইসলামের শাহেদে আদেল এবং তাদের ইজমা শরীয়তের দলিল তাই তাদের এসব মতামত সকলকে মানতে হবে। সেটা হলো হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে। কিন্তু মানুষের আমলী যিন্দেগীতে হাদীস আমলযোগ্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন মূলনীতি রয়েছে। তার মধ্যে সকলের কাছে আবশ্যকীয় মূলনীতি হলো রাসূল (সা.)-এর দেওয়া মূলনীতি। রাসূল (সা.)-এর ভাষায় মুসলমানদের জন্য মডেল হলো তিন যুগ। সাহাবী, তাবেঈন, এবং তবেতাবেঈনের যুগ। এই তিন যুগে যারা রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করেছেন, তাদের অনুসরণ পুরো উম্মতের জন্য আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে তাদের আমলের সাথে সহীহ হাদীসের বিরোধ দেখা গেলে গ্রহণযোগ্য হবে তাদের আমল। এটিই কারণ সকল মুহাদ্দিস তাদের কাছে বিশাল হাদীস সম্ভার মওজুদ থাকা সত্ত্বেও চার ইমামের যেকোনো ইমামের অনুসারী ছিলেন। কারণ তাঁরা প্রত্যেকে রাসূল (সা.)-এর উক্ত মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কেউ হাদীসের সহীহ জয়ীফের উসূলকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূল (সা.)-এর দেওয়া মূলনীতি থেকে সরে যাননি। ইসলামের মূল ধারা চার মাযহাব থেকে নিজেকে উর্ধ্বে বলে প্রচার করেননি। এত বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কেউ এই উদ্যোগ নেননি যে, প্রচলিত এই চার মাযহাবকে ভেঙে সহীহ একটি মাযহাব বানানো প্রয়োজন। কেউ বলেননি, চার মাযহাব বাদ দিয়ে একমাত্র সহীহ হাদীসের ওপরই আমাদের চলতে হবে। অথচ হাদীসের সহীহ ও জয়ীফ হওয়ার উসূল তাদেরই বানানো। তাদের নিজ নিজ মূলনীতির ভিত্তিতে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সে কারণেই তাঁরা সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের মূল ধারার একেকটি সুবিশাল স্তম্ভ।

ফাজায়েলে আমালে উল্লিখিত হাদীস

ফাজায়েলে আমালের হাদীসগুলো তাখরীজ এবং তাহকীক জানার পর আমরা যদি দেখি এর বেশির ভাগ হাদীস সহীহ বা হাসান। কিছু কিছু জয়ীফ বা মওজু হাদীসও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

এখন আলোচনার বিষয় হলো, বাস্তবে যদি ফাজায়েলে আমালের অবস্থা এই হয়, তবে বোঝা যাবে অন্যান্য হাদীসের কিতাব অনুসারেই এই কিতাবের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে। হযরত শায়খ (রহ.) এ কথাও দাবি করেননি যে, ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থে সবই সহীহ হাদীস। হাদীসের মূলনীতি অনুসারে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণীয়, এটির ওপর মুহাদ্দিসগণ একমত।

এই বাস্তবতার পরও কিছু মহল থেকে এটিকে একটি পরিত্যাজ্য কিতাব বলে দাবি করা, মিডিয়াতে বসে লম্বা লম্বা কথা বলা, বড় গলায় কমেন্ট করে এ কিতাব সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপনের অপপ্রয়াস চালানো, কথায় কথায় এই কিতাব সম্পর্কে মিথ্যারোপ করা ইত্যাদির উদ্দেশ্য কী?

এর পেছনে সক্রিয় থাকতে পারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য। যেমন :

১. এটির মাধ্যমে মানুষ হেদায়াত পাচ্ছেন। কিন্তু উক্ত মহল হেদায়াত চান না। চান মুসলমানগণ সবাই তাদের মতো গোমরাহ হয়ে যাক।

২. ফাজায়েলে আমালের কথা বলে সকল হাদীসের কিতাব সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করা। মুসলমানগণ যাতে সমস্ত হাদীসের কিতাবের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে তাদের কতিপয় গোমরাহীপূর্ণ কিতাবের ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করে।

৩. উম্মতের সমস্ত মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুফাসসির, উলামায়ে কেরামসহ ইসলামের সকল কর্ণধার সলফে সালেহীনদের সম্পর্কে মুসলমানগণের ভক্তি ও বিশ্বাস হ্রাস করা।

৪. এমনকি সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও মুসলমানদের কঠিন ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করা।

৫. তাবলীগ জমাআত, যা আজ সারা দুনিয়ায় হেদায়াতের আলো চড়াচ্ছে তার প্রতি মুসলমানদের সন্দিহান করে তোলা।

৬। উলামায়ে দেওবন্দ, যারা সঠিক ইসলামের রক্ষাকবচ তাদের প্রতি মুসলমানদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে নিশ্চিহ্ন করা।

৭. ইসলামকে ধ্বংস করার একটি পরিকল্পিত নীলনকশা বাস্তবায়ন করা।

মুসলমানদের আত্মবিধ্বংসী এরূপ কিছু উদ্দেশ্য ব্যতীত এহেন তোলপাড় ও সারাক্ষণ মিথ্যা প্রলাপের আর কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফাজায়েলে আমালের পরিপূর্ণ তাখরীজ ও তাহকীক সম্পন্ন হওয়ার পর সম্মানিত পাঠকদের কাছে এদের মুখোশ এমনিতেই উন্মোচিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আশা, এই কাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় হলেও সুহৃদগণ আল-আবরারের পাশে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা সবার সহায় হোন এবং এই কাজ মকবূলিয়াতের সাথে সুসম্পন্ন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।